জুলাই গণঅভ্যুত্থানে
কওমী মাদ্রাসা ও আলেম সমাজ

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে
কওমী মাদ্রাসা ও আলেম সমাজ

জাওয়াদ আহমাদ

নতুন প্রজন্মের প্রকাশনা
ইন্তিফাদা
বুকস

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে কওমী মাদ্রাসা ও আলেম সমাজ

লেখক	জাওয়াদ আহমাদ
প্রথম প্রকাশ	বইমেলা, ২০২৫ খ্রি.
প্রচ্ছদ	খন্দকার যুবাইর
পৃষ্ঠাসজ্জা	টিম ফাউন্টেন
স্বত্ব	লেখক
প্রকাশক	আবদুর রহমান আদ-দাখিল
প্রকাশনা	ইন্তিফাদা বুকস
বইমেলা পরিবেশক	বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
পরিবেশনা	ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স
বিক্রয়কেন্দ্র	দোকান নং ২১, কওমি মার্কেট ১ম তলা, ৬৫/১ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ফোন: +৮৮০ ১৭৬৮-৮৬৪৪২৮ (সেলস) +৮৮০ ১৭৮৯-৮৫৪৬০২ (অফিস)
অনলাইন পরিবেশক	Rokomari - Wafilife - Boisodai
আইএসবিএন	৯৭৮-৯৮৪-৯৭৯৬০-৬-০

মুদ্রিত মূল্য : ৩০০ ৳

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা । ৭
শুরুর আগের কথা । ৯
শুরুর কথা । ১২
কোটার সাথে কওমীর কী সম্পর্ক? । ১৬
হুজুরদের না থাকাই ছিল থাকা । ১৮
ফেসবুক যখন হাতিয়ার । ২০
দেশ স্বাধীন না হলে আমার লাশও খুঁজে পাওয়া যেত না! । ২২
হাজত থেকে বের হয়ে দেখি দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে । ২৫
আন্দোলনে যাওয়ার জন্য মায়ের নাম্বার ব্লক করে রেখেছিলাম । ২৮
উত্তরায় মাদ্রাসার ছাত্রদের সাহসী অবস্থান । ৩৮
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে জামিয়া ফরিদাবাদ । ৪৩
আন্দোলনের পাওয়ার হাউজ যাত্রাবাড়ি মাদ্রাসা । ৪৮
ফ্যাসিবাদ বিরোধী অগ্রসেনানী জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা । ৫৩
মাদারিসে কওমীয়া মুহাম্মাদপুর ও জুলাই গণঅভ্যুত্থান । ৫৫
আন্দোলনে ঢাকার বাইরের মাদ্রাসাসমূহের অবদান । ৫৬
হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও আমাদের গণআন্দোলন । ৫৭
আমার সন্তানের লাশ নিয়ে আমরা কবরস্থানের দিকে যাব না । ৬০
সরকারকে শায়খ হারুন ইজহার হাফি.-এর দশ নাসিহা । ৬২
জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশের প্রাসঙ্গিকতা । ৬৬
মুক্তির আন্দোলনে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ । ৬৯
আমারও কিছু বলার আছে । ৭২
একটি পুঞ্জীভূত ক্ষোভ থেকে সৃষ্টি সাধারণ আলেম সমাজের । ৭৪
সংহতি সমাবেশে মুসা আল হাফিজ হাফি. । ৮০
আন্দোলনটি কোটা ইস্যুর চেয়েও গভীর : মুসা আল হাফিজ । ৮৪

কোটা আন্দোলনের শুরুতে সরকার পতনের রোডম্যাপ ছিল মুসা আল হাফিজের কলামে : সাঈদ চৌধুরী । ৯০
যেকোনো জুলুমের বিরুদ্ধে উলামায়ে কেরাম ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন । ৯২
দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত ছাত্রদের সাথে ছিলাম, আছি এবং থাকব । ৯৪
সংহতি সমাবেশে মুফতি আমিনির দৌহিত্র আশরাফ মাহদী । ৯৯
আন্দোলনে কওমী ঘরানার যত মিডিয়া । ১০১
শহীদ মাহমুদুল হাসান মাহদি রহ. । ১১৩
শহীদ খুবাইব বিন আব্দুর রহমান রহ. । ১১৬
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে চোখ হারানো আমজাদ । ১১৯
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে এক পা হারানো জুনায়েদ । ১২০
হুজুররা এতদিন কোথায় ছিল? । ১২১
১৩ সালে হুজুরদের মানুষ মনে করলে আজ ২৪ হতো না । ১২৩
এই প্রথম কোনো আন্দোলনকে জঙ্গি আন্দোলন প্রমাণ করা যায়নি । ১২৫
বেফাক তুমি কার? । ১২৬
আন্দোলন ব্যর্থ হলে কওমী মাদ্রাসার কী হতো? । ১২৮
অভ্যুত্থান পরবর্তী দেশ সংরক্ষণ ও সংস্কারে আলেম সমাজ । ১৩০
রাষ্ট্র সংস্কারে কওমী তরুণদের সুযোগ দেওয়ার সময় কি হয়নি? । ১৩২
দেখা যদি না হয় আর, তবে ক্ষমা করে দিও । ১৩৪
শেষ কথা । ১৩৭
জুলাই বিপ্লবে মাদ্রাসার শিক্ষার্থী শহীদগণের তালিকা (প্রাথমিক) । ১৩৮

প্রকাশকের কথা

কোনো সন্দেহ নেই, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে বাংলাদেশের ইতিহাসের নতুন বাঁক। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই একে বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্বাধীনতা এবং দ্বিতীয় মুক্তি স্বীকৃতি দিচ্ছে। আওয়ামী ফ্যাসিবাদের করালগ্রাস যেভাবে বাংলাদেশকে অষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে দিয়েছিল, তা থেকে কোনোদিন মুক্তি মিলতে পারে, সে আশাই ছেড়ে দিয়েছিল বাংলাদেশের মানুষ। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার সিদ্ধান্ত ছিল ভিন্ন। তার সংবিধানে লেখা আছে, জুলুম কখনো স্থায়ী হয়না। ফলে তার লিখে রাখা সময়ে এবং পরিকল্পিত নিয়মেই এক অবিশ্বাস্য স্ফুরণের সাক্ষী হলাম আমরা—যা হয়তো একমাস আগেও আমরা কল্পনা করিনি। সামান্য কোটা আন্দোলন রূপ নিল স্বৈরাচার পতনের উত্তাল স্রোতে; যার তীব্র ধাক্কা তাসের ঘরের মতো নিমিষেই ভেঙে খানখান করে দিয়েছিল ফ্যাসিবাদী শক্তির সকল ক্ষমতা।

বলাবাহুল্য যে, এই মহা উত্তাল জনস্রোতে দেশের প্রতিটি শ্রেণীপেশার মানুষ অংশ নিয়েছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। যার ফলেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি তরান্বিত হয়েছে। বিশেষ করে আন্দোলন যখন স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনে রুপান্তরিত হয়নি, তখন থেকেই কওমি মাদরাসার ছাত্ররা নিজেদের উদ্যোগে আন্দোলনের সমর্থনে পথে নেমেছিল; যদিও কোটা আন্দোলনের সাথে কওমি মাদরাসা ও আলেমদের জড়িত হবার কোনো কারণ ছিল না। আর আন্দোলন যখন মহাসমুদ্রে রূপ নেয়, তখন কওমি মাদরাসার ছাত্রদের বৃহত অংশগ্রহণ বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

মূলত সিপাহি বিদ্রোহ থেকে ২৪-এর জুলাই গণঅভ্যুত্থান—বাংলাদেশের প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে আলেম সমাজ ও তৌহিদী জনতা ছিলেন প্রথম সারিতে। ব্রিটিশ বিরোধী লড়াইয়ে মুজাহিদ আলেমদের ফাঁসি, ভাষা আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের আত্মত্যাগ ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য

অংশ। কিন্তু এক কুচক্রী মহল বারবার তাঁদের এই গৌরবময় ভূমিকা মুছে ফেলার অপচেষ্টা চালিয়েছে।

সর্বশেষ ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানেও কওমি মাদ্রাসার ছাত্র ও আলেম সমাজের ভূমিকা অনন্য। ফ্যাসিবাদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে রাস্তায় নেমে আসা এসব আলেম ওলামা, মাদরাসা ছাত্র ও তৌহিদী জনতার অনেকেই শহীদ হয়েছেন, অনেকে আহত হয়ে চিরতরে পঙ্গু হয়েছেন। তাদের আত্মত্যাগই এক নতুন বাংলাদেশের ভিত্তি রচিত হয়েছে। এই বইয়ে আমরা অত্যন্ত সংক্ষেপে তাদের সেই অবদান তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, যেন সত্য ইতিহাস প্রজন্মের পর প্রজন্ম সংরক্ষিত থাকে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, ২৪ এর গন অভ্যুত্থানে কওমি মাদরাসা ও আলেম সমাজের অবদান বাংলাদেশের ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তাদের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মূল্যায়ন প্রয়োজন। এই বইটি সেই জাতীয় ইতিহাসের প্রতি অঙ্গীকার, যা নতুন প্রজন্মকে জানাতে সাহায্য করবে যে, কওমি মাদরাসা ও আলেম সমাজের ভূমিকা কখনো অস্বীকারযোগ্য ছিল না, এবং ভবিষ্যতেও তা অক্ষুণ্ণ থাকবে। প্রকাশক হিসেবে আমি বিশ্বাস করি যে, বাংলাদেশের ইতিহাসের এই মহান অধ্যায়কে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা ও সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজনীয়, যাতে জনগণ তাদের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের গুরুত্ব বুঝতে পারে এবং সঠিকভাবে শ্রদ্ধা জানাতে পারে।

আবদুর রহমান আদ-দাখিল
প্রকাশক, ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স
২০-০২-২৫ খ্রিষ্টাব্দ

শুরুর আগের কথা

এই পাক ভারত উপমহাদেশে দেশ, দশ ও দ্বীন ইসলামের উপর আঘাত আসলে সবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়ে যে কাফেলা, তা হলো—আহলে হকের পতাকাবাহী কওমী মাদ্রাসা ও আলেম সমাজ। ১৮৫৭ এর সিপাহি বিপ্লব থেকে শুরু করে ১৯৪৭ এর দেশভাগ এবং ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে ২৪-এর গণঅভ্যুত্থান! এমন কোনো গণআন্দোলন পাবেন না যেখানে কওমী মাদ্রাসা ও আলেম উলামার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা নেই।

অবশ্য এ সিলসিলা ১৮৫৭ থেকে শুরু হয়নি বরং এর প্রারম্ভিকা রচনা করেছেন বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত আমাদের নবী হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে নবুয়ত প্রাপ্তির আগে ও পরে পুরোটা সময় দেশের স্বার্থে, দশের স্বার্থে দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করতে যখন যা করণীয় তাই করেছেন। কাবা ঘর পুননির্মাণে পাথর বহন থেকে শুরু করে, মাটি খনন সবকিছুতে তার শতভাগ অংশগ্রহণ ছিল। নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই তিনি আরবদল, উপদল থেকে পেয়েছিলেন “আমিন” (বিশ্বাসী) নামক উপাধি। পাশাপাশি হাজরে আসওয়াদ প্রতিস্থাপনের গুরু দায়িত্বও পালন করেছেন সকল গোত্রের সম্মতিক্রমেই।

মূলত, কওমী মাদ্রাসা ও আলেম সমাজ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুরুত্বপূর্ণ এই সুন্নাতের পরিপূর্ণ হক আদায়ে সবসময় সচেষ্ট থাকেন। তাই যখনই মানবতার মুক্তির ডাকে কিছু করার সুযোগ থাকে, সর্বাগ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে তারা দুইবার ভাবেন না। কওমী মাদ্রাসা ও আলেম সমাজ কখনই ধর্ম, দেশ ও জনতাকে আলাদা নজরে দেখেন না। তাদের দৃষ্টিতে ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ধর্ম। এ ধর্মের ভেতরে দেশ আছে, দশ আছে, আছে দেশ-দশকে মুক্ত স্বাধীন করার গুরুদায়িত্বও। আর এ দায়িত্ব পালনে কোনোদিনই কওমী মাদ্রাসা ও আলেম সমাজ পিছপা হননি, ইনশাআল্লাহ হবেনও না!

এতদাসত্ত্বেও দেশপ্রেমিক, দশপ্রেমিক, জনহিতাকাঙ্খী এ শ্রেণিকে কেউ অবমূল্যায়ন করে, কেউ অস্বীকার করে আবার কেউ সব জেনে বুঝেও থাকে চুপচাপ! তবে প্রয়োজনের সময় সব পেছনে ফেলে তারা যেমন ডাকতে ভুলে না, তেমনই দায়িত্ব জ্ঞান করে কওমী মাদ্রাসা ও আলেম সমাজও লাব্বাইক বলতে দেরি করেন না। এর জলজ্যান্ত উপমা ২৪-এর গণঅভ্যুত্থান! কোটা বিলুপ্তের দাবিতে শুরু হওয়া এই আন্দোলন যখন ফ্যাসিস্ট সরকারের দমন পিড়নের কবলে লাশের সারিতে রূপান্তর হচ্ছিল, তখনই এ আন্দোলনের সাথে সম্মতি জ্ঞাপন করে অনলাইন, অফলাইনে নিজেদের সর্বোচ্চটা দিয়ে মাঠে নামে কওমী মাদ্রাসা ও আলেম সমাজ। যার ফলে শতাধিক শহীদ ও সহস্রাধিক আহত শুধু কওমী মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক ও আলেম উলামা।

কিন্তু দুঃখের বিষয়! একশ্রেণির মানুষ আলেম উলামার অবদানকে স্বীকার তো করতেই চায় না বরং জায়গা অজায়গায় সুযোগ পেলে প্রশ্ন ছুড়ে বসে, হুজুররা এতদিন কোথায় ছিল? কওমী মাদ্রাসা ও আলেম উলামাকে চতুর্থ শ্রেণির জাতিগোষ্ঠি হিসেবে জ্ঞান করে! অবশ্য চামচিকা যদি সূর্যের আলোয় দেখতে না পায়, তবে সে দোষ কি সূর্যের হতে পারে! সে জায়গা থেকে বলা যায়, এ দুঃখ কওমী মাদ্রাসা ও আলেম সমাজের না। বরং এটা তাদেরই দুঃখ ও ব্যথার বিষয় হওয়া উচিত। যারা কী-না, জেনে-না-জেনে দেশপ্রেমিক একটা কমিউনিটিকে অস্বীকার করছে এবং তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখছে।

কওমী মাদ্রাসা ও আলেম সমাজ মুক্তির আন্দোলনে যতটা অগ্রভাগে নিজেদের অবদানকে প্রচার প্রসারে ঠিক ততটাই পেছনে! ফলে এই অবদানগুলো নির্দিষ্ট কারো প্রয়োজনেই ব্যবহার হয়ে আসছে যুগের পর যুগ!

ভারত-পাকিস্তানের চিত্র কিছুটা ভিন্ন। আজাদির আন্দোলনে ভারতে আলেম উলামা ও দেওবন্দের অবদান পুরো ভারতব্যাপি স্বীকৃত। যদিও মোদির হিন্দুত্ববাদী সরকার মুসলিম নিধনে তৎপর, তারপরও ভারতজুড়ে আলেম উলামা ও দেওবন্দের ইতিহাস স্বীকৃত চর্চিত। পাকিস্তানেও একই। বলা যায় ভারতের থেকেও পাকিস্তানের অবস্থা এক্ষেত্রে ভালো। তবে বাংলাদেশ একেবারে ভিন্ন! ২০ হাজারের অধিক কওমী মাদ্রাসা ও কোটির

অধিক ছাত্র থাকা সত্ত্বেও আজ অবধি না মিলেছে কার্যকরী সরকারি স্বীকৃতি আর না প্রতিষ্ঠা হয়েছে সামাজিক মূল্যবোধ। এটা এ দেশের জন্যই দুঃখের বিষয় বলা যায়।

যাহোক! আরশে যার স্বীকৃত সম্মান দুনিয়ার অস্বিকৃতিতে তার কী আসে যায়! সেজন্য কওমী মাদ্রাসা ও আলেম সমাজ হয়তো কোনোদিনই নিজেদের স্বীকৃতি আদায়ে কঠোর কোনো কর্মসূচি দেবেন না বা দুঃখ আক্ষেপে বিলোপ করবেন না। তবে তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য-অবদান, অবশ্যই সংরক্ষিত থাকার দরকার। তাদের প্রাপ্য স্বীকৃতি আদায় করা দরকার। এটা এদেশের আপামর জনতার জন্যই মঙ্গলজনক।

শুরুর কথা

দেশে সেসময় ইন্ডিয়া আউট ক্যাম্পেইন চলছিল। এরমধ্যে খবর আসল ভারত বাংলাদেশে রেল ট্রানজিট পাচ্ছে। জনমনে আগে থেকেই ইন্ডিয়ার প্রতি ঘৃণা ছিল এ সংবাদে জনক্ষোভ আরো কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছিল। এরমধ্যে শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কারের আন্দোলনটা সামনে আসে। ইন্ডিয়া আউট ক্যাম্পেইন চলাকালে নতুন একটা আন্দোলন দানা বাঁধতে দেখে অনেকেই ধারণা করেছিল ইন্ডিয়ার রেল ট্রানজিট ইস্যুটিকে ধামাচাপা দিতে র বা আওয়ামীলীগ এই আন্দোলন করাচ্ছে।

এমনকি জুলাই গণ অভ্যুত্থানের অন্যতম স্টেক হোল্ডার পিনাকী ভট্টাচার্য দাদাও এ আন্দোলনকে শুরুতে নেগেটিভভাবে দেখেছিল। ৫ তারিখের পর বাংলা ব্লকড কর্মসূচি দিলে পিনাকি দা এই শব্দটা যে কলকাতা থেকে আমদানি এমন একটা ক্রিটিকও করেছিল। এই নেগেটিভ ভাবে দেখার একটা যৌক্তিক কারণ ছিল। কেননা ফ্যাসিস্ট হাসিনার আমলে এমন বহু ঘটনা ঘটেছে, যেগুলো ঘটানো হয়েছে জাস্ট কোনো একটা ঘটনা ঢাকতে। ইস্যু ঢাকতে নতুন ইস্যু তৈরি করতে হাসিনার জুড়ি ছিল না! কিন্তু বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন যখন রক্ত দিয়ে জীবনের মায়া ত্যাগ করে একর পর এক কর্মসূচি দিতে থাকে তখন আস্তে আস্তে সকলেই এই আন্দোলনের যৌক্তিকতা, বাস্তবতা, ভালোভাবে অনুভব করতে থাকে। ফলে ক্রমশই তাদের সাথে একাত্মতার হার চক্রবৃদ্ধি আকারে বাড়তে থাকে।

জুলাইয়ের ১ তারিখ থেকে এই আন্দোলন আলোচনায় আসলেও এর শুরুটা হয়েছে আরেকটু আগে। ১৮ সালে চাকরিতে শতভাগ কোটার বিলুপ্ত হওয়ার পর ৫ জুন ২০২৪ এ হাইকোর্ট থেকে এই শতভাগ কোটার বিলুপ্তির পরিপত্র বাতিল করা হয়। এ রায় প্রকাশিত হবার পর ঢাকাসহ সারাদেশের

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কোটা সংস্কারের দাবিতে একত্রিত হন। এরপর কুরবানির ঈদ ও গ্রীষ্মকালীন ছুটি একসাথে শুরু হলে আন্দোলন

স্থগিত থাকে। পরে জুলাইয়ের ১ তারিখ থেকে নতুন করে পুনরায় আন্দোলন শুরু হয়।

ছোট্ট শিশু যেভাবে একটু একটু করে হাঁটতে শিখে, তেমনই ২৪-এর কোটা সংস্কার আন্দোলনটি একটু একটু করে বড় হতে শুরু করে। প্রথমদিন শুধু বিক্ষোভ মিছিল, দ্বিতীয় দিন ১ ঘণ্টা অবরোধ কর্মসূচি, তৃতীয় দিন দেড়ঘণ্টা অবরোধ কর্মসসূচি, চতুর্থ দিন ৫ ঘণ্টা অবরোধ, পঞ্চম দিন ছাত্রধর্মঘট ঘোষণা দেওয়া হয়। এরপর একে একে ছাত্রদের সাথে সাথে ছাত্রীদেরও ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ করা হয়। এভাবে ৯ জুলাই সকাল সন্ধ্যা বাংলা ব্লকড নামে অবরোধ কর্মসূচি দেওয়া হয়। সারাদেশে পুলিশের বাধা থাকা সত্ত্বেও বাংলা ব্লকড কর্মসূচি পালন করে ছাত্ররা।

আন্দোলন শুরু হওয়ার পর কাঠালরানী খ্যাত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চীনের সফরে দেশের বাইরে ছিল। সবার ধারণা ছিল হাসিনা দেশে আসলে এই আন্দোলনের একটা সুরাহা হয়ে যাবে। কিন্তু ঘটনা ঘটে তার উল্টো! হাসিনা দেশে এসে এক সংবাদ সম্মেলনে আন্দোলনকারীদের "রাজাকারের নাতিপুতি" বলে সম্বোধন করে। আসলে এখানে তার দোষের তুলনায় তার সামনে উপবিষ্ট চাটুকার গোষ্ঠিরই দোষ বেশি ছিল। তাকে এমন প্রশ্ন করা হয়েছিল, যার ফলশ্রুতিতে আন্দোলনকারীদের রাজাকারের নাতিপুতি বলে সম্মোধন করতে হয়। এর প্রেক্ষিতে সেদিন রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো থেকে—

তুমি কে, আমি কে?

রাজাকার! রাজাকার!

কে বলেছে, কে বলেছে?

স্বৈরাচার! স্বৈরাচার!

এই শ্লোগানে মিছিল বের হয়। এটা এমন এক শ্লোগান ছিল যা বাংলাদেশে

বিগত ১৭ বছরের হাসিনার আমলে সৃষ্টি হওয়া জুলুমবাজ ন্যারেটিভকে ভেঙেচুরে খান খান করে দিয়েছিল। হাসিনা তার পুরো শাসনামলে বিরোধী মত ও পথকে এই রাজাকার নামক ট্যাগ দিয়ে দমন করেছে। চালিয়েছে জুলম ও নিপীড়নও। কিন্তু সেদিন রাজাকার শব্দটিকে বাংলাদেশের জমিন থেকে চিরদিনের মতো জয় বাংলা (সর্বস্বান্ত) করে দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়।

এরপর! ঘটে এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। ১৬ জুলাই রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাইদকে একেবারে সম্মুখ থেকে গুলি করে পুলিশ! যে ঘটনা পুরো দেশের মানুষকে নাড়িয়ে দেয়। আবু সাইদ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটা সংস্কার আন্দোলনের সমন্বয়ক ছিলেন। পুলিশের ধাওয়াতে সবাই পিছে হটলেও দুই হাত প্রসারিত করে প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি। তার ধারণা ছিল, এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ট্যাক্সে চলা পুলিশ তাকে গুলি করবে না। কিন্তু হায়েনার রূপে দাঁড়িয়ে থাকা পোশাকধারী পুলিশ তার ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বুক বরাবর গুলি করে। সেদিন সারাদেশে আবু সাইদসহ ৬ জন শহীদ হন। আহত হন কয়েক হাজার।

একদিনে ৬ জন শহীদ হওয়ার পর এই আন্দোলন আর স্রেফ কোটা সংস্কার আন্দোলনে আটকে থাকে না। এই ৬ শহীদ আন্দোলনের বারুদকে সর্বপ্রথম ব্যাপকহারে প্রজ্জ্বলিত করে। ১৭ তারিখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো থেকে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের কুকুর তাড়ানোর মতো করে বিতাড়িত করা হয়। ১৮ তারিখ মেধাবী শিক্ষার্থী মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধসহ সারাদেশে ২০ জনের অধিক ছাত্র শহীদ হয়। মুগ্ধের এই মৃত্যু পাষাণ হৃদয়ের অধিকারীর চোখেও পানি আনতে বাধ্য করে। বোঝাই যাচ্ছে, এই আন্দোলন আর কোটা সংস্কার আন্দোলনে নেই। এর বারুদ ছড়িয়ে পড়েছে পুরো দেশব্যাপি। এ পর্যন্ত শুরুর কথা হিসেবে ক্ষ্যান্ত দেওয়া যায়। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অলরেডি আমরা প্রবেশ করেছি। এরপর ইন্টারনেট অফ করে দেওয়া, সমন্বয়কদের উঠিয়ে নিয়ে আন্দোলন থামানোর চেষ্টা করা, জামাত শিবির নিষিদ্ধ করা, সর্বশেষ ছাত্র জনতার তোপের মুখে হাসিনার পলায়ন! এর মাঝে বাংলাদেশের মাটি ও বুক ভারী হয় ২ হাজারের অধিক শহীদ

কোটার সাথে কওমীর কী সম্পর্ক?

আন্দোলনের সূত্রপাত হয় সরকারি চাকরিতে চেতনার নামে কোটাবাজির বাড়াবাড়িতে। সরকারি চাকরিতে ৫৫ শতাংশ নিয়োগ কোটার ভিত্তিতে আর ৪৫ শতাংশ নিয়োগ মেধার ভিত্তিতে। এরমধ্যে মুক্তিযোদ্ধার নাতিপুতিদের জন্যই বরা ৩০ শতাংশ। নারী ১০ শতাংশ, জেলা ১০ শতাংশ, ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠীর জন্য ৫ শতাংশ। এখানে কওমী মাদ্রাসার জন্য কোনো শতাংশই নেই। শতাংশ থাকবে কীভাবে! কওমী মাদ্রাসার সার্টিফিকেটের চার আনার মূল্যই তো এই রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছে সেদিনও ছিল না, আজও নেই।

বলা হতে পারে যে, আওয়ামীলীগ আমলে তো কওমী সনদের মান দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তা মান-না-অপমান সেটাই ভাবনার বিষয়। যখন সরকারি অফিসগুলোর গেটে লেখা থাকে কওমী সনদ গ্রহণযোগ্য না, তখন এটাকে আমরা অপমান হিসেবেই দেখি। সে জায়গা থেকে হাসিনাশাহীর দেওয়া কওমী সনদ পুরো কওমী অঙ্গনের জন্য অপমান বটেই।

তাহলে ল্যাঠা তো প্রথমেই চুকে যায়! কোটাবাজির বিরুদ্ধে শুরু হওয়া আন্দোলনে কওমী মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক ও দেশের আলেম উলামার অন্তর্ভুক্ত থাকার প্রয়োজনই থাকে না! কিন্তু ল্যাঠা এখানে চুকবে না। কারণ কওমী মাদ্রাসা এমন এক ব্যারাকের নাম যেখানে লাউ আর ডালের পানি খেয়ে জীবন যাপন করা সৈন্যরা দেশ-দশ ও সমাজের চাহিদায় সবার আগে সবার সাথে জীবন দিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে নিজেদের চাকরির কোনো সুযোগ সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শুরু থেকে সমর্থন সম্মতি ও আন্দোলন তুঙ্গে উঠলে একেকটা এলাকায় দূর্গ বানিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে কওমী মাদ্রাসার অরুণ তরুণেরা।

যৌক্তিক এই আন্দোলনে একের পর এক লাশ পড়তে পড়তে অভ্যুত্থানে

হুজুরদের না থাকাই ছিল থাকা

শিরোনাম দেখে একটু হাসতে পারেন! না থাকা আবার থাকা হয় কীভাবে? থাকা যখন আন্দোলনকে পণ্ড করা বা অন্য খাতে প্রবাহিত করার সুযোগ সৃষ্টি করে তখন না থাকার অর্থই হচ্ছে থাকা। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলি! ফ্যাসিস্ট হাসিনা যে কয়টা টার্মকার্ড ইউজ করে বিগত ১৭ বছর নিজের মসনদ টিকিয়ে রেখেছিল এবং আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায় করে আসছিল তার অন্যতম হচ্ছে ‘জঙ্গি দমন’। আর আন্তর্জাতিক কালো চোখে জঙ্গি মানে জুব্বা, দাড়ি, টুপি মিশ্রণে প্রতিবাদী কোনো চিত্র। তাই গণঅভ্যুত্থান পূর্ব সময়ে ফ্যাসিষ্ট হাসিনার আমলে যতগুলো ম্যাসাকার হয়েছে, তারমধ্যে সবচেয়ে বড় ম্যাসাকার—তেরো সালের ৫ই মে রাতে হেফাজতের হত্যাযজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও জাতীয়ভাবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে হাসিনাকে কোনো চাপে পড়তে হয়নি। বরং জঙ্গি দমনে হাসিনা সরকার যে সফল এটা সে আন্তর্জাতিক মহলে প্রমাণ করতে পেরেছে। ফলে যখনই আলেম উলামা তৌহিদি জনতা কোনো আন্দোলনে নামতো তখন এটাকে পণ্ড করতে গুলির আদেশ প্রদানে এক দণ্ডও অপেক্ষা করতে হতো না! যার উজ্জ্বল প্রমাণ ২০ সালে মোদিবিরোধী আন্দোলন। এই আন্দোলনের জের ধরে শুধু ছাত্র জনতাকেই হত্যা করেনি বরং দেশের সাহসী সন্তান, দেশপ্রেমিক আলেম উলামাদেরকেও দীর্ঘ কারাবরণে বাধ্য করেছে।

এখন যে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে এই অভ্যুত্থান সফল হলো এটা অংকুরেই নষ্ট করে দিত, যদি দেখত এখানে জুব্বা দাড়ি টুপিওয়ালা হুজুর আছে। কারণ এই হুজুর শ্রেণির রক্তের মূল্য, না হাসিনার কাছে আছে আর না দেশের অন্য সাধারণ কারো কাছে। ফলে হুজুররা শুরু থেকে দৃশ্যমান থাকলে, দশটা হুজুরের লাশ ফেলে আন্দোলনও থামিয়ে দেওয়া যেত। আবার কেউ কোনো প্রতিবাদও করত না। যেমন করেনি হেফাজতের সময়। বরং শিক্ষিত একটা শ্রেণি সবসময় হাসিঠাট্টাই করেছে বলা যায়। সে জায়গা থেকে

ফেসবুক যখন হাতিয়ার

ফেসবুক প্রজন্ম, অনলাইন প্রজন্ম বলে গালি খাওয়া জেনারেশন যখন সত্যি সত্যিই ফেসবুক ও অনলাইনের মাধ্যমে একটা যৌক্তিক আন্দোলন শুরু করে, এর সফল সমাপ্তি ঘটিয়ে দেয় তখন বলতেই হয় ফেসবুক এই প্রজন্মের বড় হাতিয়ার। আন্দোলন শুরু থেকে নিয়ে আন্দোলন বালেগ হওয়া অর্থাৎ এর লেলিহান শিখা দেশব্যাপি ছড়িয়ে যাওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলনের অন্যতম চালিকা শক্তি ছিল ফেসবুক। ফেসবুকের পোস্ট-লাইক-কমেন্ট-শেয়ার একজন ব্যক্তি কার পক্ষে সমর্থন যোগাচ্ছে এটা প্রমাণ করত। সমন্বয়কদের যাবতীয় কর্মসূচি মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ত ফেসবুকের মাধ্যমে। কওমী মাদ্রাসার ছাত্র ও আলেম সমাজের প্রথম সমর্থন আসতে শুরু হয় ফেসবুকে। কওমী মাদ্রাসা পড়ুয়া ফেসবুক এক্টিভিস্টগণ শুরু থেকেই এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন দিয়েছেন।

সেসময় কওমী মাদ্রাসা পড়ুয়া কোনো ছাত্র বা আলেমদের মধ্য হতে উল্লেখযোগ্য এমন একজনকেও পাওয়া যাবে না, যে এ আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে। বিরোধিতা প্রসঙ্গ আনলাম এ জন্য যে, তখন অনলাইনে বহুত সুশীল সেলিব্রিটি ছিল, যারা এ আন্দোনে সমর্থন তো করেইনি, উল্টো এর বিরোধিতা করেছে, এর বিরোধী ক্যাম্পেইনে অংশ নিয়েছে। সে জায়গা থেকে বিরোধিতা না করাটাও আন্দোলনের সহযোগিতার অংশ হিসেবে আমরা গর্বের সাথে বলতে পারি, আহলে হক একজন আলেমও ছাত্রদের যৌক্তিক এই দাবির সাথে দ্বিমত পোষণ করেননি, এর বিরোধিতা করেননি।

আপনি যদি এসময়ের কওমী ঘরানার জনপ্রিয় তরুণ এক্টিভিস্ট—আশরাফ মাহদী, তানজিল আরেফিন আদনান, আব্দুল্লাহ আল মাসউদ, রিদওয়ানুল হক, আশরাফুল হক, নেসারুদ্দীন রুম্মান, রায়হান তামীম,

দেশ স্বাধীন না হলে আমার লাশও খুঁজে পাওয়া যেত না!

আন্দোলনের দিনগুলোতে যাদের ফেসবুক পোস্টে আমরা আপটুডেট থাকতাম, তাদের একজন আমাদের ছবিয়াল ভাই, ইখলাস আল ফাহিম। সেসময় ইখলাস ভাই তার বোনের চিকিৎসার জন্য বেশ পেরেশান ছিলেন। তারপরও সময় সুযোগ করে অনলাইনে সর্বোচ্চ এক্টিভিটি চালিয়ে গেছেন। অফলাইনেও মাঠে নেমেছিলেন তিনি। ইখলাস ভাইয়ের সাথে তার সেসময়ের এক্টিভিটি নিয়ে খুব সামান্য সময় কথা হয়েছে, সে আলোচনাই এখানে তুলে ধরছি।

আমি : ২৪-এর গণঅভ্যুত্থানে আপনাকে আমরা নিউজ রিপোর্টারের মতো আপডেট দিতে দেখেছি, সেসময় এভাবে পোস্ট করতেন, ভয় লাগত না?

ইখলাস আল ফাহীম : সত্যি বলতে ভয় তখন আর ছিল না। ১৮-এর কোটা আন্দোলনে আমি সরাসরি মাঠে ছিলাম নিয়মিতই। এরপর সড়ক আন্দোলনেও ছিলাম। প্রতিদিন ফরিদাবাদ থেকে যেতাম ক্যামেরা নিয়ে, ছবি তুলতাম, ধাওয়া খেতাম আবার চলে আসতাম। ২-৩ বার এমন হয়েছে, ক্যামেরা হাতের গ্রিপে আটকে থাকায় পড়ে গিয়েও ভাঙেনি। একবার পুলিশ আর ছাত্রলীগ দুইপাশে। আমরা প্রায় ২০-২৫ জন ধানমন্ডির এক বাসার ছাদে-রুমে, যে যেখানে পেরেছি পালিয়েছিলাম। সাথী কয়েকজন আহত হয়েছিল। আমার পরিচিত এক ফটো সাংবাদিকের ক্যামেরা নিয়ে নেয় ওরা। ঘণ্টাদুয়েক পর বের হয়ে আবার আন্দোলন করেছি। এগুলো তখনকার সময়ের টুকরো টুকরো কথা। সত্যি বলতে আমার ভয় তখনই চলে গিয়েছিল। এবার ভয় বলতে কিছু ছিল না।

হাজত থেকে বের হয়ে দেখি দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সম্মুখপানে আমাদের যে ক’জন ভাই লড়াই করেছেন, রায়হান আহমেদ তামীম তাদের একজন। অনলাইনে তো সক্রিয় ছিলেনই সাথে মাঠেও ছিলেন সমানতালে। শেষদিন গ্রেফতারও হয়েছিলেন। রায়হান তামিমের সাথে সংক্ষিপ্ত কিছু কথোপকথন হয়েছে। চলুন পড়ে দেখি—

আমি : আন্দোলনে কবে থেকে নেমেছিলেন?

রায়হান তামীম : আন্দোলনে শুরু থেকেই যুক্ত ছিলাম। সম্ভবত ৮/৯ জুলাই প্রথম রাস্তায় নেমে আসি।

আমি : কোটার সাথে তো কওমীর ছাত্রদের সম্পৃক্ততা ছিল না, আপনার মোটিভটা কী ছিল?

রায়হান তামীম : কোটা বাতিলের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা তো মানবিক দাবি ছিল। এর জন্য নিজের স্বার্থ থাকাটা জরুরি মনে করি না। একজন শিক্ষার্থী এতগুলো বছর পড়াশোনা করে চাকরি পাবার ক্ষেত্রে নাম্বার বেশি পেয়েও পিছিয়ে যায়, শুধুমাত্র কোটার কারণে! এটা তো অমানবিক! একজন সচেতন মানুষ হিসেবে এর বিরোধিতা সবসময়ই করেছি, ১৮-এর কোটা সংস্কার আন্দোলনেও।

আমি : অনলাইনে আপনার এক্টিভিটি প্রশংসনীয় ছিল, অফলাইনেও বেশ সক্রিয় ছিলেন আপনি, কোনো হুমকি ধামকির সম্মুখীন হয়েছেন কি না?

রায়হান তামীম : অনলাইনে বেশ কিছু হুমকি-ধমকি পেয়েছি। তেমন গুরুত্ব দিইনি। এছাড়াও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থাগুলো থেকেও

আন্দোলনে যাওয়ার জন্য মায়ের নাম্বার ব্লক করে রেখেছিলাম

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ডেডিকেশন নিয়ে রাস্তায় নামতে যে কজন কওমী পড়ুয়াকে দেখেছিলাম, আমার বন্ধু আনিসুল মুরসালিন তাদের একজন। আমরা একসাথে দেশ-দশ-সমাজ নিয়ে অনেক আলাপ করেছি, অনেক রাত পার করেছি। নেট অফ ও কারফিউ শুরুর সময় আমি ছিলাম রাজশাহী। তখন মুরসালিনকে ফোন দিয়ে আপডেট নিতাম। মুরসালিন এবছর জামিয়া মাদানিয়া বারিধারার দাওরা হাদিসের ছাত্র। পাশাপাশি কবি নজরুল কলেজে ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে অধ্যায়নরত আছে। আন্দোলনের দিনগুলোর স্মৃতিচারণ নিয়ে তার সাক্ষাৎকারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত যাত্রাবাড়ি এরিয়ার সার্বিক পরিস্থিতি জানতে পারবেন।

আমি : জুলাই আন্দোলনে কবে থেকে অংশ নিয়েছিলেন?

মুরসালিন : ১৮-ই জুলাই থেকে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করি। তার আগে ১৫-ই জুলাই থেকে অনলাইনে এক্টিভ হই এবং ছটফট করতে থাকি রাজপথে নেমে আন্দোলন করার জন্য। কিন্তু ওই তিনদিন আন্দোলন হচ্ছিল অনেকটা ক্যাম্পাস আর হল কেন্দ্রিক, যার কারণে ভেতরে ভেতরে ছটফট করলেও আন্দোলনে অংশ নিতে পারছিলাম না।

আমি : এই আন্দোলন তো ছিল কোটা পদ্ধতির বিরুদ্ধে, আপনি তো মাদ্রাসার ছাত্র, কোটার ঝামেলা নেই, আপনি কেন আন্দোলনে গেলেন?

মুরসালিন : আমি মাদ্রাসার ছাত্র হিসেবে আমার সাথে কোটার কোনো সংযোগ নেই এটা যেমন সত্য আবার আমি তো কলেজেও পড়তেছি, সেই হিসেবে কোটাবিরোধী আন্দোলনে আমারও স্বার্থ আছে এটাও সত্য। তবে এর

উত্তরায় মাদ্রাসার ছাত্রদের সাহসী অবস্থান

জুলাই গণঅভ্যুত্থান অভ্যুত্থান হিসেবে রূপ দেওয়ার বিশেষ সহযোগী ছিল উত্তরার এক্টিভিটি। কারণ ঢাবি যেদিন বন্ধ ঘোষণা করা হয় এবং নেট অফ করে দেওয়া হয় তারপর আন্দোলন কন্টিনিউ করে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির পোলাপান। আর অধিকাংশ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি উত্তরার সাইডে হওয়ায় এই আন্দোলনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে উত্তরা। উত্তরাতে সামনের সারিতে নেতৃত্ব যারা দিয়েছেন, রফিকুল ইসলাম আইনি ভাই তাদের অন্যতম। তার নেতৃত্বে প্রাইভেটের সাথে সাথে মাদ্রাসারও অসংখ্য স্টুডেন্ট মাঠে নামে। চলুন তার মুখেই উত্তরার আন্দোলন ও মাদ্রাসার ছাত্রদের অবদান শুনি।

আমি : আন্দোলনে কবে থেকে নেমেছিলেন?

আইনি ভাই : কোটা সংস্কার আন্দোলনের শুরু থেকেই তো এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ছিল। তাছাড়া আপনি জানেন বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে তার যাবতীয় দমন নিপীড়নের প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করেছি আমরা। তবে প্রথম মানসিকভাবে ধাক্কা খাই ১৫ তারিখে। যখন ছাত্রলীগের ছেলেরা মেয়েদের গায়ে পর্যন্ত হাত তুলে, বিশেষত একটা ছবি তোয়া নামের ভয়ার্থ জুবুথুব হয়ে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটার ছবি দেখে আর স্থির থাকতে পারিনি। পরেরদিন ১৬ তারিখ উত্তরাতে মাঠে নামি। সেদিন অল্পকিছু মাদ্রাসার ছাত্র ছিল। আমরা সন্ধ্যাতে চলে যাই।

আমি : আমরা দেখেছি উত্তরাতে বেশ এক্টিভ ছিলেন। তারপর কীভাবে আন্দোলন কন্টিনিউ করলেন?

আইনি ভাই : ১৮ তারিখে যখন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন শাটডাউন কর্মসূচি দেয় তখন আমরা পরিকল্পিতভাবে মাঠে নামি। উত্তরার মাদ্রাসার ছাত্রদের সাথে আমার পরিচয় ও সম্পর্ক ছিল আবার আমি

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে জামিয়া ফরিদাবাদ

আন্দোলন যখন তুঙ্গে ছাত্রদের পক্ষ থেকে কমপ্লিট শাটডাউন ও অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি চলছে। আমি মনে মনে চাচ্ছিলাম, আমাদের ফরিদাবাদ থেকে সমষ্টিগতভাবে বের হোক। শুধু আমিই না তখন সবার মনের মধ্যে এমন এক অবস্থা চলছিল। ছাত্ররা নিয়মিত পত্রিকা নিচ্ছিল। যারা মোবাইল রাখত তারা কমবেশি সবসময় আপডেট জানাচ্ছিল। বলা যায় আমদের দাওরাসহ পুরো মাদ্রাসার ছাত্ররা অস্থিরতার মধ্য দিয়ে সময় পার করছিল। এরমধ্যে দায়িত্বশীল ছাত্ররা সংশ্লিষ্ট দুয়েকজন উস্তাদের কাছে গিয়ে আবেদনও জানাচ্ছিল।

সময়টা এমন ছিল, উস্তাদগণ বিশেষত তরুণ শিক্ষক যারা আছেন তারা কমবেশি সবাই চাচ্ছিলেন মাদ্রাসার ছাত্ররাও এই জুলুমের বিরুদ্ধে অংশ নিক। প্রাতিষ্ঠানিক কিছু নিয়ম কানুনের জন্য তারা সরাসরি বলতে পারছিলেন না 'তোমরাও নামো'। আবার বিবেকের দায়ে নিষেধ করতেও পারছিলেন না। একপ্রকার ইশারায় বুঝিয়েছিলেন, জামিয়া ফরিদাবাদ উম্মাহ ও দেশের প্রয়োজনে কখনো পিছিয়ে ছিল না, এখনো থাকবে না।

এই ইশারাতেই আমাদের দাওরার দায়িত্বশীল ছাত্ররা বিশেষত রেজাউল, মুস্তাসিম, মাসউদ, সাআদ, আব্দুল্লাহসহ প্রতি রুমের জিম্মাদার ও সচেতন ছাত্ররা মেশকাত জালালাইনের দায়িত্বশীল ছাত্রদের নিয়ে পরামর্শ করে। এটা ৩ তারিখ রাতের ঘটনা। ৪ তারিখে সর্বপ্রথম ফরিদাবাদ থেকে আমরা একসাথে শ্লোগান দিয়ে মাদ্রাসার মাঠে জমা হই। তারপর মাদ্রাসার গেট থেকে পোস্তগোলা অভিমুখে মিছিল নিয়ে রওনা হই। এসময়ে আমাদের ছাত্র ভাইয়েরা নানাধরনের ফ্যাসিবাদ-বিরোধী শ্লোগান দিচ্ছিল। ফরিদাবাদের ছাত্রদের বের হতে দেখে এলাকাবাসী খুব খুশি হয়। আমাদের সাথে এলাকাবাসীও মিছিলে অংশ নেয়।

আন্দোলনের পাওয়ার হাউজ যাত্রাবাড়ি মাদ্রাসা

জুলাই আন্দোলেনে যাত্রাবাড়ি এলাকার কথা আপনাদের মনে থাকার কথা। কেউ বলে আন্দোলনের পাওয়ার হাউজ আবার কেউ বলে লাইট হাউজ। তবে পাওয়ার হাউজ বলেন আর লাইট হাউজ বলেন যাত্রাবাড়ির আন্দোলনে প্রাণ ছিল মাদ্রাসার ছাত্ররা। কীভাবে একটু বুঝিয়ে বলি। যাত্রাবাড়িতে কোনো ইউনিভার্সিটি ছিল না! আবার এমন কোনো কলেজও নাই যার আবাসিক হলো ম্যানব্যাংক হিসেবে কাজে আসবে। তবে যাত্রাবাড়িতে কী আছে? শুধু যাত্রাবাড়ি এলাকার চতুর্পাশে ছোটবড় মিলিয়ে ২ হাজারেরে অধিক কওমী মাদ্রাসা আছে। এই মাদ্রাসাগুলোই যাত্রাবাড়ির আন্দোলনের পাওয়ার ব্যাংক হিসেবে কাজ করেছে। এমনিতে ঘনবসতি এরিয়া তার উপর এতগুলো মাদ্রাসা, সবমিলিয়ে যাত্রাবাড়িতে আন্দোলনে সাধারণ জনতার বিশেষ সাহসের জায়গা ছিল মাদ্রাসার ছাত্ররা।

এখানে শুধু যাত্রাবাড়ি বড় মাদ্রাসার কথা বলছি তা না! যাত্রাবাড়ির ছোটবড় সব মাদ্রাসা মিলেই যাত্রাবাড়ি মাদ্রাসা। পুরো যাত্রাবাড়ি এরিয়াটা মাদ্রাসা দিয়ে ঘেরা। ফলে যেদিক দিয়েই এনিমি আসুক মাদ্রাসার ছাত্রদের ফেইস করতে হয়েছে। তবে আন্দোলনে একটা গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করেছে সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর প্রিয় এই মাদ্রাসা।

যাত্রাবাড়ি বড় মাদ্রাসায় ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৭ হাজার। বড় ছাত্রদের একটা অংশ কুতুবখালি এলাকার বিল্ডিংগুলোতে থেকে অনাবাসিক পড়াশোনা করে। আবার ফারেগীন ছাত্রদের একটা অংশ মাদ্রাসার আশেপাশে থেকে নিজেদের ব্যবসা ও চাকরি-বাকরি করে। ফলে যাত্রাবাড়ি বড় মাদ্রাসার আশেপাশের বিল্ডিং রাস্তাঘাট সবকিছু বড় মাদ্রাসার ছাত্র দিয়ে ঘেরা।

১৮ তারিখ পর্যন্ত বড় মাদ্রাসার বর্তমান ও সাবেক ছাত্ররা দুইভাবে মাঠে

ফ্যাসিবাদ বিরোধী অগ্রসেনানী জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা

হাসিনার ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াইয়ে যদি ৫টি প্রতিষ্ঠানের নাম থাকে তবে জামিয়া মাদানিয়া বারিধারার নাম থাকবে তাতে। এটা শুধু জুলাই গণঅভ্যুত্থানের কথা বলছি না বরং হাসিনার পুরো শাসনামলের সময়ের সামগ্রিক অবস্থার কথা বলছি। জামিয়া মাদানিয়া বারিধারার প্রতিষ্ঠাতা ও মুহতামিম আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমী রহ. আমৃত্য হাসিনার ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা করে গেছেন। কাসেমী রহ.-এর জীবদ্দশায় ফ্যাসিবাদ বিরোধী সকল আন্দোলনে বারিধারার ছাত্ররা স্বশরীরে অংশগ্রহণ করত। সেসময় কাসেমী রহ. রাজনীতি ও হাসিনার ফ্যাসিবাদ বিরোধিতায় এতটাই প্রাসঙ্গিক ছিলেন যে, মাওলানা মামুনুল হকদের মতো ব্যক্তিদের উপর প্রশাসন থেকে চাপ থাকত, সব করা যাবে কিন্তু বারিধারা ও কাসেমী সাহেবের সাথে থাকা যাবে না। একথা কাসেমী সাহেবের ইন্তেকালের পর স্মরণসভায় মাওলানা মামুনুল হক সাহেব নিজে বলেছেন।

এন্টি হাসিনা রুলের জন্য বারিধারার বর্তমান মুহতামিম মুফতি মুনির কাসেমীকে দীর্ঘদিন কারাবরণও করতে হয়।

জুলাইয়ে কোটা সংস্কার আন্দোলন যখন শুরু হয় তখন বারিধারা প্রথম আন্দোলনে কন্ট্রিবিউট করে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ঠান্ডা পানি ও শরবত খাওয়ানোর মাধ্যমে। ১৫ জুলাই মঙ্গলবার। বারিধারা মাদ্রাসার সাথেই নতুন বাজার মোড়ে পুরো রাস্তা ব্লক করে আন্দোলন করছিল ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা। মাদ্রাসার কয়েকজন ছাত্র খেয়াল করল প্রখর রোদে তীব্র তাপদাহে ছাত্ররা আন্দোলনরত অবস্থায় আছে। তারা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পানি-শরবত খাওয়ানোর ইচ্ছা করল। প্রথমে তারা মাওলানা জাকির কাসেমী সাহেবের কাছে গিয়ে নিজেদের অভিব্যক্তি